ঔষধ বাছাই প্রণালী



ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় ডি এম এস

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
দুটি কথা	...	...	....	(৭)
পূর্বভাস	...	...	...	৯
প্রথম অধ্যায়—লক্ষণকোষের ব্যবহারতত্ত্ব—(১)		...	...	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়—লক্ষণকোষের ব্যবহারতত্ত্ব—(২)		...	...	২১
তৃতীয় অধ্যায়—গাণিতিক পদ্ধতি		...	...	৩২
চতুর্থ অধ্যায়—চক্রাবর্ত প্রণালী—(১)		...	...	৪৮
পঞ্চম অধ্যায়—চক্রাবর্ত প্রণালী—(২)		...	...	৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায়—চক্রাবর্ত প্রণালী—(৩)		...	...	৫৯
সপ্তম অধ্যায়—সহচর লক্ষণের নীতি		...	...	৭১
অষ্টম অধ্যায়—কারণতত্ত্বের সাহায্যে ঔষধ বাছাই		...	...	৮৩
নবম অধ্যায়—মারী ঔষধতত্ত্ব	...	...	...	৯৪
দশম অধ্যায়—প্রজ্ঞাদর্শন	...	...	...	৯৬
পরিশিষ্ট—				
(ক) বি-১ ডাঃ কেন্টের নির্দেশিত লক্ষণসমূহের মূল্যমান তালিকা			...	১০১
বি-২ ঔষধ বাছাইকরণের কয়েকটি উদাহরণ			...	১০২
নির্ঘন্ট	...	...	...	১১০

প্রথম অধ্যায়

লক্ষণকোষের ব্যবহারতত্ত্ব—(১)

লক্ষণলিপিকরণের কৌশল

লক্ষণকোষের বা রেপার্টরির সাহায্য নেওয়া বর্তমান যুগে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন বিনা লক্ষণকোষেই চিকিৎসা করা চলতো অনায়াসেই। শুধু তাই নয়, স্বয়ং হ্যানিম্যান ছিলেন তৎকালীন লক্ষণকোষের ব্যবহারের বিরোধী; অবশ্য কারণও ছিল কিছু। হ্যানিম্যানের আমলে মেটিরিয়া মেডিকায় (ভৈষজ্যকোষে) বর্ণিত ঔষধের না ছিল প্রাচুর্য, না ছিল ঔষধসমূহের সম্বন্ধে এত জটিলতা। পরন্তু, ঔষধসমূহের যাবতীয় লক্ষণের প্রকৃত লক্ষণকোষজাতীয় পুস্তকেরও ছিল একান্ত অভাব। যে দু-একটা লক্ষণকোষের ব্যবহার ছিল তৎকালে, তা ছিল যথেষ্ট অসম্পূর্ণ, ভ্রান্তিমূলক এবং এমনকি কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া আর একটা বিরাট ত্রুটি ছিল, তাদের মধ্যে লক্ষণাদির কোন বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস ছিল না, যে জন্য কাজের সময় কোন রকমেই সে পুস্তক সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হতো প্রায় অসম্ভব। এই সব বিভিন্ন কারণেই লক্ষণকোষের প্রতি হ্যানিম্যানের বিরাগ ছিল কিছুটা। হ্যানিম্যান অবশ্য লক্ষণকোষমাত্রেরই বিরোধী ছিলেন না। কারণ, লক্ষণকোষের যে একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মূল্য আছে, হ্যানিম্যান সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন যথেষ্ট। যেহেতু, সঠিক লক্ষণ-কোষের প্রথম রচয়িতা ডাঃ বোনিংহাউসেনের লেখা রেপার্টরি অফ দি অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন (Repertory of the Antipsoric Medicine) যেটি ১৮৮৩ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়, পুস্তকের ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং হ্যানিম্যান। এ থেকে বোঝা যায় যে, হ্যানিম্যান প্রকৃতপক্ষে লক্ষণকোষের বিরোধী ছিলেন না। তা ছাড়া, হ্যানিম্যানোত্তর যুগের অন্যান্য হোমিওপ্যাথধন্বন্তরিগণও লক্ষণকোষের বহুল প্রচার ও ব্যবহারের ছিলেন পক্ষপাতী।

সঠিক ও সুন্দর লক্ষণকোষ রচনায় প্রথম গৌরবের অধিকারী হওয়া উচিত ডাঃ বোনিংহাউসেনের। তিনি হ্যানিম্যানের নৈকট্যের সুযোগ পেয়ে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে ছিলেন সুপরিচিত। তিনি যে লক্ষণকোষ রচনা করেন, তার কার্যকারিতার দিক দিয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নেই এবং তা কোনরূপ ভ্রান্তিমূলকও নয়। বোনিংহাউসেনের লক্ষণকোষের মধ্যে একটি সাময়িক ত্রুটির সৃষ্টি অবশ্য হয়েছিল, যার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না মোটেই। তাঁর লক্ষণকোষের ঔষধগুলি কেবলমাত্র বহুক্রিয়ের (polychrest) মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ, সে সময়ে বহুক্রিয় ঔষধ ব্যতীত বর্তমান কালের মতো এত ঔষধের প্রাচুর্য ছিল না। অবশ্য এই ত্রুটি তাঁর পরবর্তিকালে ডাঃ লিপির পুত্র

সংশোধন করেন এবং লক্ষণকোষটিকে করেন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ।

ডাঃ বোনিংহাউসেন লক্ষণকোষের পথিকৃৎ হলেও, সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ববৃহৎ লক্ষণকোষ প্রণীত করেন স্বনামধন্য ডাঃ কেন্ট। তাঁর লক্ষণকোষই সর্বাধিক প্রচলিত। কেন্টের লক্ষণকোষের মধ্যে অনেক বহুক্রিয় ও স্বল্পক্রিয় ঔষধস্থিত লক্ষণসমূহ একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে এবং বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে সহজেই। এই সমস্ত কারণে কেন্টের লক্ষণকোষই সবিশেষ আদরণীয়। অবশ্য ডাঃ লিপির লক্ষণকোষ এবং বোনিংহাউসেনের উন্নতধরণের থেরাপিউটিক পকেট বুক (Therapeutic Pocket Book) নামক পুস্তিকাটিও কম আকর্ষণীয় নয়। বর্তমানে আরো কয়েকটি ভালো অথচ সংক্ষিপ্তকরণদোষদুষ্ট লক্ষণকোষ চালু আছে যাদের ব্যবহারক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হলেও, একেবারে পরিত্যজ্য নয়। কিন্তু ওগুলিকে ঠিক সর্বাঙ্গসুন্দর বা সর্বক্ষেত্রোপযোগীর পর্যায়ে ফেলা যায় না কিছুতেই।

লক্ষণকোষ পুস্তক বাজারে যে-পরিমাণে দেখা যায়, চিকিৎসকেরা ব্যবহারিকক্ষেত্রে সে পরিমাণে তাকে কাজে লাগাননি আজ পর্যন্ত। অবশ্য এর একটা কারণ হচ্ছে মেটিরিয়া মেডিকার পর্যাপ্ত প্রচলন। মেটিরিয়া মেডিকায় জ্ঞান যাঁদের কম নয়, তাঁরা স্বভাবতই লক্ষণকোষের বোঝা ঘাড়ে নিতে চান না। এ ছাড়া আর একটা কারণ হচ্ছে লক্ষণকোষের ব্যবহার বিষয়ে অনেকের অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং দক্ষতার অভাব। তাই লক্ষণকোষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রথমেই একটা বিরাট প্রশ্ন খাড়া হয় যে, লক্ষণকোষ বলতে কী বোঝায়? তার উত্তর কি হবে সে কথা পূর্বভাষে বলা হয়েছে।

লক্ষণকোষের ব্যবহার কোথায় কোথায় অত্যাবশ্যক সে বিষয়েও পূর্বভাষে বলেছি; কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে লক্ষণকোষের সহায়তা লওয়া অনাবশ্যক, তাও আমাদের জানা দরকার। যেখানে সদৃশতম ঔষধটি (similimum) রোগীর লক্ষণাবলী থেকে সহজেই ধরা পড়ে, সেখানে লক্ষণকোষ দেখা সময়ের অপব্যয় মাত্র। কারণ, সেই রোগীতে লক্ষণগুলি এমনভাবে চিকিৎসকের সামনে দেখা দেয় যে, সেক্ষেত্রে লক্ষণকোষ ব্যবহার করতে হলে, কেবলমাত্র তার প্রধান লক্ষণসমূহ কোন্ কোন্ ঔষধে বর্তমান, তা মিলিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; এমনিভাবে লক্ষণকোষ ঘাঁটার ফল যদিও সেই একই হয়; অর্থাৎ পূর্বোক্ত সদৃশতম ঔষধটিই সূচিত হয়; এখানে লক্ষণকোষে কেবলমাত্র সূচিত ঔষধটিকে যাচাই করা ছাড়া আর কিছুই করে না। কিন্তু মেটিরিয়া মেডিকায় যাঁদের জ্ঞান পরিপক্ক, তাঁদের পক্ষে অমনিতরো সুনির্দিষ্ট রোগলক্ষণে, ঔষধ বাছাইয়ের জন্য লক্ষণকোষের সাহায্য নেওয়া

মানেই নিজের স্মরণশক্তিকে অবিশ্বাস ও অবহেলা করা। সর্বত্রই লক্ষণকোষ ঘাঁটার অভ্যাসও যুক্তিসঙ্গত নয়। তাতে মেটিরিয়া মেডিকার প্রতি আস্থা যায় কমে, নিজের চিন্তাশক্তির উপর হয় অবিচার। লক্ষণকোষ ব্যবহারের নিয়মকানুন জেনে রাখা এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার সাহায্য নেওয়া যেমন দরকার, তেমনি মেটিরিয়া মেডিকার প্রত্যেকটি ঔষধকে সম্পূর্ণরূপে অধিগত করাও আবশ্যক। কেননা, হাতের কাছে সদাসর্বদা লক্ষণকোষ রাখা সম্ভব নয়, সুবিধা তো নয়ই। যদিও বা কেউ সঙ্গে রাখার অভ্যাস করেন সময়ের স্বল্পতাহেতু সর্বক্ষেত্রে তা উল্টানোর সুযোগ নাও পেতে পারেন। কাজেই, সর্বত্র মেটিরিয়া মেডিকার উপর দখল থাকা চাই পুরাদস্তুর এবং লক্ষণকোষের উপর নির্ভর করতে হবে তখনই যখন রোগীর অবস্থা যথেষ্ট সময় দেবে এবং সেই সঙ্গে যেখানে মেটিরিয়া মেডিকার তরীতে কূল মিলবে না সহজে।

কিন্তু লক্ষণকোষ ঘাঁটা যতখানি সহজ মনে হয় ঠিক ততখানি নয়। লক্ষণের বিরাট পরিধির মধ্যে ঠিক ঠিক লক্ষণকে বাছাই করা অত্যন্ত শক্ত কাজ। বিশেষত রোগীর মুখের ভাষার সঙ্গে লক্ষণকোষের ভাষার তফাৎ অনেকখানি; তার পরে আছে লক্ষণের এক বা একাধিক স্তরবিন্যাস এবং শেষত রয়েছে লক্ষণ-নির্দেশক ঔষধের গুরুলঘু জ্ঞানের উপর রোগিক্ষেত্রে ঔষধ বাছাইয়ের জটিল সমস্যা। অবশ্য প্রত্যেক সমাধানযোগ্য সমস্যারই একটা না একটা পথ থাকে তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার। এক্ষেত্রেও তেমনি কয়েকটি সমাধান আছে যা না জানলে লক্ষণকোষ হাতে পেয়েও কোন কাজে লাগান হয় অসম্ভব। কেমনভাবে সেই সমাধানে পৌঁছানো যাবে, তা বার করতে হলে, চিকিৎসকের সর্বাগ্রে দক্ষতা চাই লক্ষণলিপিকরণকৌশলে।

লক্ষণকোষ ব্যবহার করার পূর্বেই, রোগিপর্যবেক্ষণ ও লক্ষণসমাবেশ করার দিকে মনোযোগ দিতে হয় সুষ্ঠুভাবে। রোগীর লক্ষণসমূহকে সঠিকভাবে সঞ্চয় করার উপরেই, লক্ষণকোষ ব্যবহারের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে বহুল পরিমাণে। লক্ষণাবলী সু-সঞ্চয়ের মূলে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় পর্যবেক্ষণের। পর্যবেক্ষণ কথাটা সাধারণত ব্যবহৃত রোগিদর্শন বা দেখা কথাটা অপেক্ষা অধিক অর্থবহনযোগ্য। যেহেতু, চিকিৎসক তাঁর রোগিপর্যবেক্ষণকালে, একমাত্র দৃষ্টিশক্তিরই উপর নির্ভর করেন না পরন্তু, অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপরও নির্ভর করেন অনেকখানি এবং বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাইও করেন সেই সঙ্গে। যাই হোক, রোগিপর্যবেক্ষণ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করে প্রথমত, রোগী নিজে, দ্বিতীয়ত, রোগীর শুশ্রূষাকারিণী এবং তৃতীয়ত, চিকিৎসকের পরীক্ষণ-প্রণালী।

রোগিবর্ণিত লক্ষণাবলীকে আমরা subjective symptoms বলি যা সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ঔষধ বাছাইকারী। চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীর সংগৃহীত লক্ষণাবলী হলো objective symptoms এবং উক্ত উভয় প্রকারের

লক্ষণাবলীর সমষ্টিকেই বলা হয় লক্ষণাবলীর সামগ্রিকতা (totality of symptoms)। সামগ্রিকলক্ষণ সঞ্চয় সঠিক হওয়ার উপরেই নির্ভর করে লক্ষণকোষ ব্যবহারের সাফল্য। রোগিলক্ষণ লিপিকরণের সময় চিকিৎসককে সাধারণত একটি বাধার সম্মুখে পড়তে হয়; সেটি হচ্ছে—রোগীর রোগলক্ষণ বর্ণনার অসম্পূর্ণতা। রোগীর পূর্ণ বিবরণদানের অন্তরায় হলো প্রধানত তিনটি, যার ফলে অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী।

১। লক্ষণবর্ণনায় রোগীর অমনোযোগিতা এবং বিশ্লেষণকরণের মানসিক অভাব।

২। দীর্ঘদিন রোগভোগের ফলে, রোগলক্ষণের সঙ্গে স্বাস্থ্যের লক্ষণাবলীর মধ্যে পার্থক্যনির্ণয়ের অপারগতা; লক্ষণ বর্ণনায় ভুল তথ্যদান এবং কোন কোন লক্ষণ উল্লেখ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মরণ।

৩। রোগীর মানসিক প্রকৃতি অনুযায়ী রোগলক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে বলার স্বভাব; এবং অজ্ঞান ও শিশুরোগীর ক্ষেত্রে subjective symptoms সংগ্রহের সম্পূর্ণ অভাব।

উক্ত প্রকারের তিনটি অবস্থার জন্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর নিকট থেকে চিকিৎসকমাত্রই অসম্পূর্ণ রোগিচিত্র পেয়ে থাকেন, প্রধানত তিনটি দিক হতে; প্রত্যেক লক্ষণের বেলাতেই নিম্নোক্ত যে কোন এক বা একাধিক ঘাটতি থাকে ঃ

(ক) লক্ষণের অবস্থান নির্ণয়ের অপারঙ্গমতা; (খ) লক্ষণের অনুভূতি বর্ণনায় অক্ষমতা এবং (গ) হ্রাসবৃদ্ধির যে কোন একটির অথবা উভয়ের বিষয়েই কোনরূপ বিশ্লেষণ করার অজ্ঞতা।

উপরোক্ত তিনটি অসম্পূর্ণতা মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধিবিষয়ক অজ্ঞতাটিই হচ্ছে ঔষধ বাছাইকরণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অসুবিধা সৃষ্টিকারী; কারণ, হ্রাসবৃদ্ধিজাত লাক্ষণিক অবস্থাটি হচ্ছে ঔষধ-নির্ণয়ের চুম্বক।

এক্ষণে, উপর্যুক্ত রোগিলিপির অসম্পূর্ণতা দূর করবার উপায় কি? উপায় অবশ্য একটা আছে। এক্ষেত্রে, রোগিলিপিকরণে একটু দক্ষতা দরকার। ঐ দক্ষতাটি অর্জন করতে হলে, ঔষধপরীক্ষণকালীন লক্ষণাবলী বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। রোগিলক্ষণসংগ্রহে যে অসম্পূর্ণতা দেখি, সে অপূর্ণতা ঔষধপরীক্ষণের বেলাতেও দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ঔষধপরীক্ষণকালে পরীক্ষকের পক্ষেও অবস্থান, অনুভূতি ও হ্রাসবৃদ্ধির লক্ষণসঞ্চয়ের বিষয়েও অপূর্ণতা থেকে যায়। সেই কারণে, ঔষধ পরীক্ষার বেলা অনেকানেক পরীক্ষকের উপরেই ঔষধের পরীক্ষণ প্রয়োজন যাতে, একজনের বিবরণ অসম্পূর্ণ হলেও অপরের বিবরণলিপি থেকে সেই ফাঁকটি ভরাট করে নেওয়া হয়। তাই, ঔষধজাত লক্ষণাবলী বিশেষ অপূর্ণ থাকে না, দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া। ঔষধপরীক্ষণের

ক্ষেত্রে বহু পরীক্ষকের মধ্যে থেকে ঔষধের চিত্রটি তৈরি হয় লক্ষণাবলীর সাদৃশ্য অনুযায়ী। বহুজনে পরীক্ষিত ঔষধের মধ্যে তাই অসম্পূর্ণতা দোষটি অনুপ্রবেশের অবকাশ পায় না বড় একটা।

কিন্তু এ ছাড়া আর একভাবে পরীক্ষক উক্ত অসম্পূর্ণতা দোষটি দূর করে থাকেন তাঁর বিশ্লেষণপদ্ধতির মাধ্যমে। কোন এক অঙ্গের অনুভূতি লক্ষণের অভাবে অথবা হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যে অসম্পূর্ণতার ফাঁক দেখা দেয়, সেটিকে অন্য অঙ্গের অনুভূতির বা হ্রাসবৃদ্ধির সাদৃশ্য অনুযায়ী ভরাট করে তোলা হয়। সন্দেহ হতে পারে যে, এ ধরণের আরোপ কতখানি নীতিসঙ্গত। যুক্তি হচ্ছে এই যে, পরীক্ষক যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করেন, সেগুলি প্রায়শই কয়েকটি সম্পূর্ণ লক্ষণের ভগ্নাংশ মাত্র। মূল পরীক্ষক সেই অংশগুলিকে একীভূত করে লক্ষণের সম্পূর্ণতা সাধন করেন। ঔষধপরীক্ষণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও একীকরণের এই হলো সাধারণ পদ্ধতি।

এক্ষণে রোগিলিপিকরণের কথায় ফেরা যাক। রোগীর লক্ষণসঞ্চয়ের বেলা চিকিৎসকমাত্রই এটি খেয়াল রাখেন যে, তাঁরা রোগীর চিকিৎসা করছেন, রোগ বা রোগলক্ষণাবলীর নয়। কাজেই, লক্ষণাবলীসংগ্রহের সময়ও তাঁরা লক্ষণের সামগ্রিকতার অর্থাৎ, রোগীর দিকে দৃষ্টি রাখেন যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে। সেক্ষেত্রে রোগীবর্ণিত কোন এক বা একাধিক স্থানীয় লক্ষণের (particular symptoms) উপর তত গুরুত্ব দেন না, যেহেতু সেগুলি হচ্ছে ব্যাপকার্থে, রোগীর ব্যাপক লক্ষণের (general symptoms) অংশ মাত্র। কয়েকটি স্থানীয় লক্ষণকে একটি বিশিষ্ট বিন্যাসের ভিত্তিতে রোগীর আংশিক লক্ষণকে সম্পূর্ণাঙ্গ লক্ষণের পর্যায়ে নিয়ে আসার কৌশলই হচ্ছে, রোগি লক্ষণলিপিকরণে দক্ষতার পরিচায়ক। উক্ত আংশিক লক্ষণগুলি রোগিদেহের এদিকে সেদিকে অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে থাকে; যেমন আমরা লক্ষণকোষে বর্ণিত লক্ষণাবলীর মধ্যে দেখতে পাই। এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লক্ষণগুলির কেউ বা অনুভূতিজ্ঞাপক কেউ বা অবস্থান নির্দেশক, আবার অপরাপর কয়েকটি থাকে হ্রাসবৃদ্ধিজাত লক্ষণ হিসাবে। তাই হ্যানিম্যান বলেছেন যে, পীড়াটি হচ্ছে রোগীর—তার মাথা, চোখ, হাতপায়ের অথবা হৃৎপিণ্ডের নয়; মাথার দপ্‌দপানি ব্যথা শুধু যে মাথারই লক্ষণ, তা নয়, ওটি সমগ্র রোগটিরই অবস্থাসূচক লক্ষণ; কিংবা শরীরের কোন অঙ্গের ব্যথা-বেদনা<চলা-ফেরায় অথবা মাথাঘোরা< সন্ধ্যাকালে—এ যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হ্রাসবৃদ্ধির কথা জানিয়ে থাকে, তেমনি ওরা রোগটির সাধারণ হ্রাসবৃদ্ধির প্রতিও আলোকসম্পাত করে। এ ছাড়া, আর যে সব লক্ষণ থাকে, যেমন সর্বাঙ্গে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি—তাদের বলা হয় সহচর লক্ষণ (concomitant symptoms)। সহচর লক্ষণ ও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণাঙ্গ লক্ষণাবলীর সমাহারে গঠিত হয় লক্ষণের সামগ্রিকতা। সামগ্রিক লক্ষণাবলীই হচ্ছে, রোগীর পূর্ণাঙ্গচিত্র। সামগ্রিকতার সাহায্যে আমরা রোগীর

ব্যক্তিত্বের বা স্বকীয়তার হদিশ পাই। রেপার্টরির সাহায্যে ঔষধ বাছাই করার কাজে ওরা হল একান্তভাবে অপরিহার্য।

এক্ষণে আমরা একটি সমন্বয়সূত্রের সন্ধান পাই। আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক স্থানীয় লক্ষণই হচ্ছে, অবস্থান-অনুভূতি-হ্রাস-বৃদ্ধির বিচ্ছিন্ন সমাবেশ। অতএব, সামগ্রিকতা গঠিত হচ্ছে—ব্যাপক লক্ষণের ও অবস্থানঅনুভূতি হ্রাসবৃদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের সমাহার। অর্থাৎ, রোগীর সামগ্রিক-লক্ষণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকতে হলে, আমাদের স্থানীয় লক্ষণগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য (যা রোগীর ব্যাপক লক্ষণের পর্যায়ে পড়ে) সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে, স্থানীয় লক্ষণের অন্যান্য বিশেষত্বও লক্ষ্য করতে হবে।

উক্ত লক্ষণের একত্র সমাবেশের পর, প্রত্যেক রোগিক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত সমীকরণের সাহায্যে লক্ষণকোষ থেকে টেনে বার করতে হবে তার সদৃশ ঔষধটি। আমরা সাধারণত যে সব রোগী পাই আমাদের চিকিৎসার গণ্ডীতে, তাদের মধ্যে দেখতে পাই দু-শ্রেণীর লক্ষণ (১) রোগনির্ণায়ক লক্ষণাবলী এবং (২) ঔষধনির্বাচক লক্ষণাবলী।

রোগনির্ণায়ক লক্ষণাবলী প্রায় প্রতি রোগীতেই এক প্রকারের; কাজেই, ওদের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক ঔষধনির্বাচন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঔষধনির্বাচক লক্ষণাবলীই হচ্ছে আমাদের লক্ষণসংগ্রহের লক্ষ্যস্থল। ডাঃ হ্যানিম্যানের ভাষায়, সেই সমস্ত **অসাধারণ সিদ্ধিপ্রদ** (characteristic) লক্ষণাবলীই হলো ঔষধবাছাইকারী। প্রত্যেক রোগীতেই এদের অল্পবিস্তর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগী; সাধারণত যে শীততাপঘর্ম দেখা যায় প্রত্যেক রোগীতেই, তা হচ্ছে রোগনির্দেশক লক্ষণবিশেষ। কিন্তু কালো জ্বর আসে বেলা ৯টায়, কারো বা বেলা ১১টায়; কারো শীত সুরু হয় পীঠের শিরদাঁড়া বেয়ে—ইত্যাকার সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণাবলী, উক্ত জ্বরের ঔষধবাছাইকারী লক্ষণ। রোগিচিত্র অঙ্কনের সময় উক্তপ্রকার খুঁটিনাটি অসাধারণ, সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণসঞ্চয়ের উপরেই নির্ভর করে রোগ আরোগ্যের সফলতা। সাধারণ শ্রেণীর লক্ষণসমূহ এক্ষেত্রে অচল।

ঔষধনির্বাচক লক্ষণাবলী একত্রীকরণের ফলেই রোগীর লাক্ষণিকসামগ্রিকতা গড়ে ওঠে; চিকিৎসকের কাজই হচ্ছে উক্ত সামগ্রিকতার সন্ধান করা। এ ছাড়া লক্ষণলিপিকরণের অন্য কোন সার্থকতা নেই। লক্ষণলিপিকরণকালে যে সামগ্রিকতার সমাবেশ ঘটে, সেটিকেই রোগিচিত্র, রোগীর স্বকীয়তা (individualism) ইত্যাদি ভিন্ন নামের গণ্ডীতে বাঁধা হয়। আসলে আমরা লক্ষণসঞ্চয়ের সময়ে রোগীর এমন একটি চিত্র আঁকবার চেষ্টা করি, যার সাহায্যে প্রকৃত রোগারোগ্যকারী ঔষধের প্রতিফলন সম্ভব। অথবা

অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, রোগীর লাক্ষণিক সামগ্রিকতা হচ্ছে নির্বাচিত ঔষধের সদৃশলক্ষণাবলীর কার্বন কপি। রোগী ও ঔষধের উক্ত সদৃশতা সন্ধানের উপরেই নির্ভর করে চিকিৎসকের লক্ষণকোষ ব্যবহারের সার্থকতা।

চিকিৎসকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, নির্ভুল লক্ষণলিপিকরণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত উপায়ে লক্ষণাবলীর সুষ্ঠু বিন্যাসের উপরেই আরোগ্যদায়ী ঔষধনির্বাচনের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে। ঔষধের ক্রিয়াপরীক্ষণের সময়েও যেমন উক্ত গুণাবলীর প্রয়োজন, তেমনি কোন একটি রোগের—সেটি সমষ্টিগতভাবে মহামারী আকারেই আত্মপ্রকাশ করুক অথবা ব্যষ্টিগতরূপেই দেখা দিক—চিকিৎসার বেলাতেও ওদের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে অপরিহার্য।

কোন একটি রোগের প্রকৃত স্বরূপ পেতে হলে, আমাদের প্রয়োজন হয় অনেকগুলি ঐ জাতীয় রোগীকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা। যেমন আমরা একটি ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণাবলীর পরিচয় পেতে বহু পরীক্ষকের লক্ষণসমূহকে একত্রিত করে থাকি। কোন একজন মাত্র পরীক্ষকের লক্ষণসমষ্টি থেকে ঔষধের সম্পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি পাওয়া যায় না কখন। নানা বয়সের বহু মেয়েপুরুষের দ্বারা পরীক্ষিত ঔষধের লক্ষণসমূহকে একত্রে সংগ্রহ করার ফলে ঔষধের পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি পাওয়া সম্ভব। ব্যষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লক্ষণাবলীর সমষ্টি থেকে যে সামগ্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেটিই হচ্ছে রোগিপর্যবেক্ষণের প্রধান লক্ষ্য।

ব্যাপক মহামারী রোগের ঔষধনির্বাচনের বেলাতেও আমাদের রোগি পর্যবেক্ষণের উক্ত ধারাটিকেই অনুসরণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এখানেও আমরা ব্যষ্টির গণ্ডী থেকে সমষ্টির প্রাঙ্গণে পা বাড়িয়ে থাকি। কয়েকটি রোগীর ব্যষ্টিগত লক্ষণাবলীকে একত্রে সমাবেশ করার ফলে, যে সামগ্রিকতা ফুটে ওঠে, তার থেকেই প্রকৃত ঔষধের হদিশ পাওয়া যায় অতি সহজেই। প্রশ্ন হতে পারে এখানে হোমিওপ্যাথির রোগি-স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে আমল না দেওয়ার গূঢ়ার্থ কি? তার জবাব হচ্ছে এই যে মহামারীরোগের যে প্রাদুর্ভাব হয়, তার মূলে থাকে মানুষের মধ্যে সুপ্ত সোরার আকস্মিক জাগরণ অথবা দেহমধ্যে কোন বীজাণুর অনুপ্রবেশ কিংবা আর কিছু কারণ। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, একই বীজাণু বা সোরা বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন লক্ষণাদি প্রকাশ করে কিরূপে? এখানেই ব্যক্তিবিশেষের স্বকীয়তার কথা আসে। স্বকীয়তার পরিবেষ্টনের প্রভাবে একই বীজাণু বা সোরা থেকে বিভিন্ন লক্ষণের আত্মপ্রকাশ হয়। তাই আমরা স্বকীয়তার যে ক্ষেত্র তার উপরেই বিশেষ জোর দিই; বীজাণু ইত্যাদির কথা আসে তারপর। এ যেন একই মাটিকে বিভিন্ন ছাচে ঢেলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর রূপায়তন করার প্রাকৃতিক প্রচেষ্টা।